Bangla 2nd Paper

YEAR 2017

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

পরিবেশ দূষণ

[ঢা. বো. ১৯; ১৭, ১৫; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; বগুড়া জিলা স্কুল]

আদিমকালে মানুষ একান্তভাবেই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে শুরু করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আবিষ্কৃত প্রযুক্তির অপব্যবহার দিন দিন পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। পরিবেশ হলো আমাদের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি। পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাকৃতিক বা মানব-সৃষ্ট কোন কারণে যদি পরিবেশের উপাদানগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান বিনষ্ট হয় তাহলে পরিবেশ মানুষ বা প্রাণীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। পরিবেশের এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো- ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আর কৃত্রিম বা মনুষ্য-সৃষ্ট কারণগুলো হলো- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পকারখানায় বিষাক্ত কেমিক্যালের ব্যবহার, শিল্পকারখানা ও জানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ইত্যাদি। এসব কারণে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এছাড়া কীটনাশক, গুঁড়ো সাবান, প্লাস্টিকের ব্যবহার ইত্যাদির ফলেও পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্পকারখানা ও জানবাহন থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে বিশ্বের সচেতন মানুষ আজ শঙ্কিত। কেননা পরিবেশ দূষণের কারণে মাবন সভ্যতার অস্তিত্বই আজ হুমকীর সম্মুখীন। তাই পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বের সচেতন মানুষ জেগে উঠছে, গড়ে উঠছে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন। এসব সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় ঠিক করতে পরিবেশ বিষয়ক নানা সম্মেলনে একত্র হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশের সংবিধানেও পরিবেশ-সংক্রান্ত ধারা যুক্ত হয়েছে। তবে সরবস্তরের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা ব্যতীত পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়।

ভাবসম্প্রসারণ

মানুষ বাঁচে তাহার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নহে।

[রা.বো.১৯ ; চ.বো.১৯ ; ঢা.বো.১৭]

কর্মই মানুষকে অমর করে রাখে, বয়স নয়। বয়সে যে যত প্রবীণ হোক না কেন, কর্ম যদি উল্লেখযোগ্য না থাকে তাহলে মানুষ তাকে স্মরণ করে না। আবার বয়সে ক্ষুদ্র হলেও কর্মের দ্বারা মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং শিক্ষক ডিরোজিও অত্যন্ত কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও আপন কর্মের মহিমায় বেঁচে আছেন মানুষের মাঝে।

মানুষ মরণশীল। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে। কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের জীবনের পরিধি অপরিমেয় নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যায়। স্রষ্টার ইচ্ছায় কোনো কোনো মানুষ বাঁচে দীর্ঘদিন, আবার অনেকে আয়ু পায় স্বল্পদিন। তারপর মানুষের জীবনের অবসান হয়। আত্মীয়স্বজনরা তাকে মনে রাখে কিছুদিন; এরপর ভুলে যায়। তারপর মানুষ চিরতরে হারিয়ে যায় স্মরণের ওপারে। যার জন্ম হয়েছে তাকে মরতে হবেই। মানুষের জীবনের পরিধিও খুব বেশি নয়, কয়েক বছর মাত্র। মানুষের জীবনকাল সম্পর্কে কেউই ওয়াকেবহাল নয়। কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে আবার কেউ অভ্যঘকালের মধ্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। কেউ আবার দুই-একদিনও বাঁচে না। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকদিন শোক-তাপ পালনের মধ্যেই তাদের কর্তব্য সমাপন করে। অবশেষে দুনিয়ার মানুষ একদিন তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এই-ই হল মানুষের জীবন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে ব্যক্তি বেশি হায়াত বা দীর্ঘজীবন লাভ করে দুনিয়া হতে বিদায় নিল সে-ই দুনিয়াতে বেশি বেঁচে রইল। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। মানুষকে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য গুণরাজির সমাবেশে এ দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়াকে একটি শান্তিময় স্থান হিসাবে পরিগণিত করতে পারে। মানুষ তাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে দুনিয়াতে এমন অক্ষয়-কীর্তি স্থাপন করতে পারে যা চিরকাল জগতের মানুষের উপকারে আসবে এবং মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে ঐ মানুষকে স্মরণ করবে। এভাবে মানুষ মহৎ কর্মের দ্বারা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। মহান কীর্তিমান পুরুষ দুনিয়াতে যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন, দুনিয়া ত্যাগের পরেও বেঁচে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি অমর হয়ে থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু তাদের জীবন নয়—দুনিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্তই তাঁদের জীবন।

মানবচরিত্রে আছে দুটি দিক ভালো ও মন্দ। যাদের ভালো কাজের পরিমাণ বেশি, তারা স্মরণীয় হয়ে থাকে। আর যারা আচরণে মন্দ বলে বিবেচিত, তারা জীবিতকালে নিন্দনীয় হন এবং মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত হয়ে যান। ভালো মানুষ সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে যে অবদান রাখেন, তা মানুষ সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখে।

মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করলে এ সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ তার কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকে— বয়সের মধ্যে নয়। দুনিয়ার বহুলোক শত শত বছর পরমায়ু ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমরা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত জানি না। আবার বহুলোক অপেক্ষাকৃত কম পরমায়ু লাভ করেও ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু আজকের দুনিয়ার মানুষ ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের নাম স্মরণ করে। তাঁরা পার্থিব জীবন ত্যাগ করেও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদ (স), হযরত ঈসা (আ), হাজী মুহম্মদ মহসীন, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ ব্যক্তি বহু পূর্বে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। অথচ তাঁদের কাজ-কর্ম এবং কীর্তিকলাপের জন্য তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন। এ মরজগতের মানুষ কাজ-কর্মের মাধ্যমেই লাভ করেন অমরতা। তাই আমাদের উচিত এ নশ্বর পৃথিবীতে দীর্ঘজীবন লাভ করতে অর্থাৎ মরেও অমর হয়ে থাকার জন্য মহৎকর্ম সম্পাদন করা। কীর্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে যত দিন বেঁচে থাকেন, তাঁর কর্মপ্রবণতা আবর্তিত হয় মানুষের উপকারার্থে। এঁরা অল্পায়ু হন অথবা দীর্ঘায়ু, । তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি এ ধরনের মানুষ কোনো শ্রেণি থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, সেটাও বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচনার কথা, জ্ঞান বিষয় একটাই, সেটা হলো মানুষের কল্যাণার্থে তাঁর কর্ম কী ছিল! এ পৃথিবীতে বহু মহান ব্যক্তি ও মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনেও কাজ করে গেছেন বিশাল মাপের।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, তার বয়সের জন্য নয়। কত কোটি কোটি মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদেরকে মনে রাখে নি। তারা ভেসে গিয়েছে কালস্রোতে। অথচ যেসব কার্তিমান ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ অবিনশ্বর হয় কর্মগুণে। মানবকল্যাণে ব্যয়িত জীবন মানুষের মনে বেঁচে থাকে অনন্ত কাল। বস্তুত জীবনের সার্থকতা এখানেই নিহিত।

রচনা

অধ্যবসায়

ভূমিকা:

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।

অধ্যবসায় ছাড়া মানবজীবনের সাফল্য লাভ সুদূর পরহিত। অধ্যবসায়ই মানবজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীকে মানুষের জ্ঞান ও সুখের ভান্ডার রূপে তৈরি করেছেন। কিন্তু বিশ্ব সংসারে ছড়ানো এ অনন্ত জ্ঞান, অসীম সুখ কখনোই আপনা হতে মানুষের হাতের মুঠোই এসে পৌঁছায় নি। জগতের কোন কিছু অর্জন সাধনা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জীবনে চলার পথে যে জিনিস যত মূল্যবান, যত দুষ্প্রাপ্য, যত রহস্যময়, যত আকাঙ্ক্ষিত তাকে লাভ করার জন্য চাই তত বেশি পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাধনা। এ সবকিছুই হচ্ছে অধ্যবসায় নামক চরিত্র শক্তির এক একটি বিন্দু। এর সাথে যখনই মিলিত হয় ইচ্ছাশক্তি তখনই মানুষ হতে পারে অধ্যবসায়ী। অধ্যবসায়ের ফলেই মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে, অচেনাকে করতে পারে দৃষ্টিগোচর আর অজেয়কে করতে পারে জয়।

অধ্যবসায়ের পরিচয় বা সংজ্ঞা:

কতগুলো উপাদানের সামগ্রিক গুণের সমষ্টিই অধ্যবসায়। কোন কাজে সফলতা অর্জনের জন্য উদ্যোগ, চেষ্টা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য্য ইত্যাদি সহকারে বারবার প্রচেষ্টার নামই অধ্যবসায়। মনের সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করার সাথে সাথে চরিত্রের অন্যান্য গুণ যখন কাজে লাগানো হয় তখনই অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কর্মপ্রবাহে ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং তাতে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের পথ সহজ হয়ে যায়। অধ্যবসায় মানবজীবনের একটি মস্ত বড় শক্তি। অধ্যবসায়ীকে কোন ব্যর্থতাই দমাতে পারে না অথবা তার লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারে না। সুতরাং মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টার পুনরাবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলে।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা:

অধ্যবসায় ও প্রতিভা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অধ্যবসায়ের সাথে প্রতিভা যোগ হলেই মানুষ বড় কিছু হতে পারে। অধ্যবসায় না থাকলে শুধু প্রতিভা থাকলে কিছুই হয় না। কিন্তু অধ্যবসায় থাকলে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হয়েও বড় কার্য সাধ্য করা যায়।

জগতে বহু বিখ্যাত লোক আছেন যাঁরা প্রতিভাবান অপেক্ষা অধ্যবসায়ী ছিলেন বেশি। বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, **"আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রমের ফলে দুরূহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধারণ করতে পেরেছি।"** ফরাসি দার্শনিক ভলটেয়ার বলেছেন- **"প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও, তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে। "** ডালটন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- "লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।" তাই প্রতিভা লাভ করতে হলে অধ্যবসায়ী হওয়া প্রয়োজন এবং প্রতিভাকে অধ্যবসায়ের গুণে কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় সেপ্রতিভা বিফলে যাবে।

প্রকৃত অধ্যবসায়ী :

সংসারে এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা ব্যর্থতার আঘাতে পর্যদুস্থ হয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। এর কারণ তাদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা নেই। তারা অধ্যবসায়ী নন। প্রবাদে আছে- *"Failure is the pillare of success'* অর্থাৎ ***ব্যর্থতাই সাফল্যের স্তম্ভ***। কথাটা একান্তই সত্য শুধুমাত্র অধ্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। তারা পরাজয় স্বীকার করে না বরং দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয় এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পর্বত প্রমাণ বাধা অতিক্রম করে নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হয়। একবারের প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন এমন খ্যাতনামা লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। ব্যর্থতায় হা-হুতাশ না করে যারা তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন, তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে বিশ্ব সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন আর নিজেদের জন্য অর্জন করেছেন অম্লান গৌরব। আসলে আত্মবিশ্বাস যার যত বেশি তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা তত বেশি। ব্যর্থতার সোপান বেয়ে যিনি সাফল্যের সৌধ নির্মাণ করে তার চূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছেন তিনিই তো প্রকৃত অধ্যবসায়ী। তিনিই জগতের আদর্শ মহাপুরুষ। তিনিই দেশ ও দশের গৌরব।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা:

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়ের এক বিরাট মহিমা। প্রবাদে আছে *"Rome was not built in a day"* অর্থাৎ রোম নগরী যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি মানুষের জীবনের সার্থকতাও হঠাৎ করে একদিনে লাভ করা যায় না। কর্মজীবনে মানুষের সামনে নানারূপ বাধা বিপত্তি আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কেননা জন লিলির মতে, "জীবনের সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবনকে অস্বীকার করা। " রাতের আধারের পর যেমন দিনের আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়, ঠিক তেমনি বার বার অবিরাম প্রচেষ্টার ফলেই ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সাফল্যের শুকতারা।

পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি চারিত্রিক গুণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশ্বাস, মেধা, সুযোগ কোন কিছুই চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিতে পারে না যদি না তাদের যথার্থ প্রয়োগে অধ্যবসায়কে মুখ্য করে তোলা হয়। এ জগত সংসারের প্রতিটি মানুষকে জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। | ব্যক্তি তথা দেশ, জাতি ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাকে কিছু না কিছু অবদান রাখতে হয়। এক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। যে অধ্যবসায়ী নয়, মনের দিক থেকে সে পঙ্গু। ফলে সমাজের মহৎ কোন কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, যা কিছু কল্যাণকর তার সবই অধ্যবসায়ের দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। জগত সংসারে বাধা বিঘ্নতা অতিক্রম করার শক্তি যার যত বেশি, সাফল্যও তার তত বেশি এবং জীবন যুদ্ধে জয় লাভ করার ক্ষমতাও তার ততোধিক।

কবির ভাষায়,

“ ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য্য ধরো বাঁধো বাঁধে বুক,

শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক। ”

ছাত্রজীবন ও অধ্যবসায়:

অধ্যবসায় গড়ে উঠে ছাত্রজীবনে। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিকাল। কাজেই এ সময়ে অধ্যবসায় শিক্ষা প্রয়োজন। অলস বিমুখ ছাত্র কখনও পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারেনা। একমাত্র অধ্যবসায়ের গুণে মন্দ ছাত্রও পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে। ” No pains no gains"- এ আদর্শ বাক্যটি প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে উপলব্ধি করতে হবে। সব ছাত্র ছাত্রীই মেধাবী নয়। আবার অর্থের অভাবে অনেকে হয়ত পড়াশোনা করতে পারে না। কিন্তু তারা সকলেই যদি অধ্যবসায়ী হয় তবে সকল বাধা কেটে যাবে। ছাত্র ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে ,

“ বারে বারে জ্বলবে বাতি, হয়ত বাতি জ্বলবে না

তা বলে ভাবনা করা চলবে না। ”

সভ্যতা ও অধ্যবসায় :

মানব সভ্যতার ইতিহাসকে যদি নির্ণয় করতে হয়, তবে তার পেছনে যে মাধ্যমটি কাজ করেছে তা হলো কঠোর অধ্যবসায়। পৃথিবীর শুরু থেকে আগুনের ব্যবহার কৃষি, বাসস্থান, রান্না এবং সর্বোপরি সব কিছুর মূলেই ছিল অধ্যবসায়। আজকের মানুষ অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে স্বপ্নকে রূপান্তর করছে বাস্তবে। রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ভূ-উপগ্রহ আবিষ্কার ও নক্ষত্র মণ্ডলীতে মানুষের আজ সফল সহজ পদচারণা।

অধ্যবসায় ও সমকাল:

আজ বিশ্ব দ্রুত ধাবমান। তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে যুক্তিগত কার্যক্রম। বিশ্ব আজ ছোট হয়ে আসছে। ইচ্ছে করলেই মুখোমুখি না বসেও কথা বলা যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। মানুষ ছাড়াই ***'পাথ ফাইন্ডার'*** মঙ্গল গ্রহকে জয় করে এসেছে। বিশ্বআজ স্রষ্টার সরোবরে দপুষ্পিত পদ্ম হয়ে তার শোভাকে দ্বিগুণে শোভিত করেছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের অদম্য আবিষ্কারের কৌতূহল এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি তথা অধ্যবসায়। কেননা অধ্যবসায় ছাড়া যদি আবিষ্কারের পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করা যেত তবে মানব সৃষ্টির কোটি বছর পরেও তার বাস্তবায়ন হয় না।

অধ্যবসায় উন্নতির সোপান:

জগতে ধন সম্পদ উপার্জনেও এগুলোর সঠিক সেবা পেতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা চাই। যারা কঠোর পরিশ্রম করতে জানে, আর অধ্যবসায় দ্বারা প্রতিমূলতার মোকাবিলা করতে জানে তারা একটু দেরিতে হলেও উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। আজ আমেরিকা, জাপান কিংবা মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যে পৌঁছেছে তার পেছনে রয়েছে অধ্যবসায় নামক চারিত্রিক গুণ। কারণ প্রবাদে আছে- ***'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'***

ব্যক্তি জীবনে অধ্যবসায় :

অধ্যবসায় ব্যক্তি জীবনকে উন্নত করে। অধ্যবসায় যদি ব্যক্তি জীবনে সম্পৃক্ত হতে পারে তবে সে জীবন অবশ্যই সাফল্যের মুখ দেখবে। মানুষ সারা জীবন চলে সাধনার পথে। পৃথিবীতে সে প্রথমে আসে দুর্বল হয়ে কিন্তু প্রকৃষ্ট সাধনার বলে তাকে যোগ্যতার পরিচয় দান করতে হয়। সুখের উপকরণ জীবনে আরোপিত নয়, তাকে অর্জন করে নিতে হয়। সে অর্জন সম্ভব নয় অলস হাতে, দুর্বল মানসিকতায়। তাই মানুষকে অধ্যবসায়ী হতে হয়। জীবনকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে অধ্যবসায় অবশ্যম্ভাবী। ধনে-মানে, অবদানে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে মহিমান্বিত হলেও তাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। অধ্যবসায়কে করতে হবে জীবনের মূলমন্ত্র। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন -

" কোন কাজ ধরে যেউত্তম সেই জন হোক সহস্র বিঘ্নছাড়ে না কখন। "

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা :

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি প্রকৃত অধ্যবসায়ী হয়ে উঠে তাহলে সে জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের ন্যায্য অধিকারী হয়ে উঠবে। জাতির জ্ঞানী, গুণী, শ্রেষ্ঠ, বীর, আবিষ্কারক, সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধনার দ্বারাই সাফল্য লাভ করে জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। যে জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী, সে জাতি তত বেশি উন্নত বলে সম্মানিত। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবদীপ্ত সাফল্য দেশবাসীর অধ্যবসায়ের ফল। আবার জাতির অনগ্রসরতা জীবনে অধ্যবসায় হীনতারই কুফল। সবাই একনিষ্ঠভাবে জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগ করলে মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। অধ্যবসায়ের যে পথ ধরে আজকের বিশ্ব সভ্যতার উত্তরণ ঘটছে সে পথেই আগামী দিনের উন্নততর বিশ্ব গঠন করতে হবে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, জাতির জন্য সর্বোপরি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয়।

অধ্যবসায়ীদের কতিপয় দৃষ্টান্ত :

জীবন সংগ্রামে সাফল্যের গুপ্তদ্বার হল অধ্যবসায়। যুগ যুগের ইতিহাস কালের পর্দায় রেখে গিয়েছে তারই প্রমাণ। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিই পৃথিবীর বুকে আপন কীর্তির দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে। *স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস* অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজদের সাথে পর পর ছয় বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে বনে পালিয়ে যান। একদিন এক পরিত্যক্ত দুর্গে তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা একটি স্তম্ভের গায়ে উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু বার বার খানিকটা উঠেই পড়ে যাচ্ছে। পর পর ছয় বার বিফল হবার পরে সপ্তম বারের প্রচেষ্টায় সে স্তম্ভের গায়ে উঠতে সক্ষম হল। সামান্য একটি প্রাণীর এরূপ অদম্য প্রচেষ্টা ও সাফল্য লাভের দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। *আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাসের* ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি যখন পর্তুগালে রাজসভায় আমেরিকা আবিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন স্বয়ং রাজা পর্যন্ত রসিকতা মনে করে হাসিতে এ প্রস্তাব উড়িয়ে দেন। কিন্তু অধ্যবসায়ের মূর্ত প্রতীক কলম্বাস সব বাধা বিঘ্নতা উপেক্ষা করে মাত্র কয়েকজন সহচর নিয়ে জাহাজ নিয়ে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। নতুন মহাদ্বীপ আবিষ্কারের নেশায় তিনি যে অবিচল অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তার ফলস্বরূপ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর অক্ষত্র গৌরবের মুকুট তাঁর মস্তকে উপস্থাপিত হয়। সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর কাজে রেখে গিয়েছিলেন অধ্যবসায়ের অজস্র নিদর্শন। কোন কাজকেই তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন না।

তিনি বলেন –*"Impossible is a word that is found in the dictionary of fools"* তাই আমরা দেখতে পাই সামান্য এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও একমাত্র অধ্যবসায়ের গুনেই তিনি ফরাসি জাতির ভাগ্য বিধাতার পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। *মনীষী কার্লাইল* ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস লিখে এক প্রতিবেশিকে পড়তে দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিবেশি বন্ধুটি সেই বইটি ভুলক্রমে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ফলে বইটি হারিয়ে যায়। পরে অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়, বাড়ির চাকরাণী বইটিকে বাজে কাগজের দলা মনে করে পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু কার্লাইল হতাশ না হয়ে পুনরায় বইটি লিখেন। বাল্যকালে *রবার্ট পিলের* বাবা তাকে টেবিলের উপরে উঠিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করতে বলতেন। প্রথম প্রথম কিছু না হলেও পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে তাঁর মধ্যে বক্তৃতা প্রদানের শক্তি জেগে উঠে। পরবর্তীতে তিনিই হয়েছিলেন একজন প্রখ্যাত তর্কবিদ। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও সুকঠোর সাধনার বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানের সম্মান লাভ করতে পেরেছিলেন। দুখু মিয়া, কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করেও কবিতা, | গান, গল্প, নাটক ইত্যাদিতে রেখেছিলেন অবিনশ্বর প্রতিভার স্বাক্ষর। শুধু অধ্যবসায়ের গুণেই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক *হযরত মুহাম্মদ (স), শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট* সকলেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

অধ্যবসায়হীনের অবস্থা :

অধ্যবসায়ের অভাবে অনেক সম্ভাবনা অকালে শেষ হয়ে যায়। অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি জগতের কোন কাজেই সফল হয় না। তার জীবন ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে যায়। তার স্মৃতি হারিয়ে যায় বিস্তৃতির অতল গর্ভে। তার ঠিকানা নির্ধারিত হয় সমাজের সর্বনিম্ন আস্তাকুঁড়ে।

অধ্যবসায় ও বাঙালি জাতি :

আমরা বাঙালি জাতি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের অনেকের মধ্যেই এ মহৎ গুনটি অনুপস্থিত। আমাদের মধ্যে নেই কোন প্রচেষ্টা, নেই কোন উদ্যম, নেই কোন আগ্রহ। বরং আছে আস্ফালন, হুঙ্কার, মিথ্যে গরিমা ও নিজেকে প্রকাশ করার বাহাদুরি। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়,

**" ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো
পোষ মানা এ প্রান
বোতাম-আঁটা জামার নিচে
শান্তিতে শয়ান। "**

কেবলমাত্র অধ্যবসায়ের অভাবেই উন্নত বিশ্বের তুলনায় আজ আমরা যোজন যোজন পিছিয়ে আছি। সুতরাং, আর একটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিজেদের অধ্যবসায়ী রূপে গড়ে তোলা আমাদের একান্ত জরুরি।

উপসংহার :

অটল অধ্যবসায় ঋষির তপস্যারই নামান্তর। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারে। কঠোর তপস্যা শেষে সাধক যেমন ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করতে পারেন, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের পরিনামেও মানুষ লাভ করে ঈঙ্গিত সাফল্য। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সাফল্য লাভ করে নিজেও গৌরবান্বিত হয়, দেশ ও জাতির মুখ ও উজ্জ্বল করে।আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে-

"সুন্দর দিন সবার জন্যই অপেক্ষা করে
কেউ ডেকে আনে, কেই আনে না। "

এই আনা না আনার সঙ্গেই অধ্যবসায়ের সম্পর্ক। আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হলে জীবনে সফলতা অনিবার্য। *"life is not a bed of roses"* জীবন পুষ্প শয্যা নয়। দুর্গমতা, বাধা-বিঘ্নতা অতিক্রম করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে পারলেই আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

RAJSHAHI BOARD

অনুচ্ছেদ

শিশুশ্রম

[রা. বো. ১৯, ১৭; ব. বো. ১৯; জালালাবাদ ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

শিশুকাল অতিক্রমের আগে অর্থের বিনিময়ে বা বিনা বেতনে কেউ কায়িকশ্রমের কাজে নিয়োজিত হলে তাকে শিশুশ্রম বলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই ধরনের শ্রমকে শোষণ বলে বিবেচনা করে। বহু দেশে এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের দেশেও শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। শিশুশ্রমকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস পালিত হয়। মূলত অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিশুশ্রমের সাথে নিয়োজিত। অষ্টাদশ সতাব্দীর শেষ দিকে গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৬ সালে শিশু সনদে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও থেমে নেই শিশুশ্রম। লেখাপড়ার খরচ দিতে না পারা, সংসারের অসচ্ছলতা পিতা-মাতাকে বাধ্য করে সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে। শিশুশ্রম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে। একটি দেশের গুনগত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে শিশুশ্রম কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের মাঝে সুপ্ত থাকে অমিত সম্ভাবনা। আজকের শিশুই আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ বা শিক্ষাবিদ। ভবিষ্যতের কর্ণধার এই শিশুদের নির্ঝঞ্ঝাট ও মসৃণ পথচলা নিশ্চিত করতে পারলেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পথ অনেকটা সুগম হয়। তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও সুযোগ থাকলে ব্যক্তি উদ্যোগে শিশুশ্রম বন্ধে তৎপর হওয়া জরুরি। শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে ও তাদের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

সারাংশ

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ-কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও, আর শুরু করো দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

[রাজশাহী বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

মানুষের জীবনে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নয়- গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বর্তমান। কেননা, অতীত পরিবর্তন কপ্রা সম্ভব নয়, আর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কাজেই , আমাদের উচিত প্রতিদিনের বর্তমান সময়ে বাঁচা।

কিসে হয় মর্যাদা ? দামি কাপড়, গাড়ি, ঘোড়া ও ঠাকুরদাদার কালের উপাধিতে? – মর্যাদা এইসব জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই তোমার ভিতর। তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয় কিনা, তোমায় দেখলে দাসদাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর। বা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন। আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলব- যাও।

[রাজশাহী বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

মানুষের আসল মর্যাদা অর্থ-বিত্তে নয়- হয় অন্তরের মহত্ত্ব দিয়ে। অঢেল অর্থ ও সম্পদশালী হয়েও যদি কেউ মানবিক না হয়, তবে সে সমাজে যতই সমাদর পাক না কেন, প্রকৃত মানুষের কাছে সে সবসময় ঘৃণার পাত্র হয়েই থাকবে।

সারমর্ম

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।

[রাজশাহী বোর্ড ’১৭]

সারমর্মঃ
পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সকল ধর্মের মূল উৎসারিত হয়েছে মানুষের হৃদয় থেকে। মানুষের হৃদয়ই সবচেয়ে পবিত্র সত্যের জন্ম দেয়। ফলে, দিনশেষে সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার চাইতেও যে সত্য বড় হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে মানবিকতা।

আবেদনপত্র

প্রশ্ন: অগ্রিম ছুটি চেয়ে দরখাস্ত লেখ।

[রাজশাহী বোর্ড '১৭]

০৫/২/২০২২

প্রধান শিক্ষক,

ক বিদ্যালয়,

সাভার, ঢাকা।

বিষয়ঃ তিন দিনের অগ্রিম ছুটির মঞ্জুরের আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত ছাত্র। আগামী ০৭/০২/২০২২ আমার বড়বোনের বিয়ে। এই কারনে আমি আগামী ০৬/০২/২০২২ তারিখ থেকে ০৮/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারব না।

অতএব, আমার আকুল আবেদন, বিষয়টি বিবেচনা করে আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক,

আপনার অনুগত ছাত্র

খ

দশম শ্রেণি,

মানবিক বিভাগ

রোল নম্বর-১

JESSORE BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

সারাংশ

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

[যশোর বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

বর্তমান সময়ে মানুষ অর্থের পেছনে এমনভাবে ছুটছে, যে এই অর্থলোলুপতা কখন তাদের মন্যষ্যত্বহীন করে তুলছে তা তারা টেরও পাচ্ছে না। যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনকে জীবনের মুল উদ্দেশ্য করে সবাই এমন অবস্থায় পৌঁছেছে , যেখান থেকে আশু উত্তরণ আবশ্যক।

CHITTAGONG BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

সারমর্ম

আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাঁপড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো,
অরুণ রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটবো গো।
নিত্য নবীন গৌরবে, ছড়িয়ে দেব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটবো গো।

[চট্টগ্রাম বোর্ড '১৭]

সারমর্মঃ

সমাজকে সুন্দর করে তোলার সম্ভাবনা নবীনদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যে নিহিত। আজকের শিশু-কিশোররা আগামীতে সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারলেই ভবিষ্যতের পৃথিবী সুন্দর হবে।

DINAJPUR BOARD

অনুচ্ছেদ

একুশে বইমেলা

[দি. বো. ১৯, ১৭; সি. বো. ১৭; য. বো. ১৯; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; নোয়াখালী জিলা স্কুল]

অমর একুশে গ্রন্থমেলা বর্তমানে বাঙালির প্রাণের মেলা। এই মেলার ইতিহাস বাংলাদেশের মতই প্রাচীন। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী এ মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন অনেক বিস্তৃত ও পরিণত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম এই মেলা। বইপ্রেমী বাঙালির চাহিদা মেটাতে বাংলা একাডেমি ২০১৪ সালে মেলার পরিসর বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করেছে। ক্রেতাদের আকর্ষণে প্রকাশকদের আয়োজনের কমতি থাকে না। নান্দনিক স্টল ও দৃষ্টিনন্দন বই পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে নতুন বই হাতে তুলে নিতে। মাসব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় ক্রেতাদের জন্য থাকে বিশেষ ছাড়। বিখ্যাত লোকদেরও দেখা মেলে মেলায় এলে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন আলোচনাসভা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে লেখককুঞ্জ, যেখানে লেখকরা উপস্থিত থাকেন ও পাঠকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এটি বাংলা একাডেমির একটি মহৎ উদ্যোগ ও আয়োজন। এই মেলা নিত্যনতুন পাঠক তৈরিতেও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। সারা বছর নানা বয়সি মানুষ এ মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। লেখক-প্রকাশক-পাঠকের অসাধারণ এক সেতুবন্ধ রচিত হয় এ মেলায়। এখানে এলেই সাহিত্যের সকল রসদের সন্ধান পান সকল শ্রেণীপেশার মানুষ। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত।

অনুচ্ছেদ

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের ঐতিহ্য, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশের একটি জাতীয় পতাকা থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশেরও তেমনি একটি নির্দিষ্ট নকশার পতাকা রয়েছে। আমাদের জাতীয় পতাকার রং লাল-সবুজ। এর নকশায় ঘন সবুজ রঙের ওপর লাল রঙের একটি বৃত্ত রয়েছে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ ঃ ৬। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মূল নকশাকার শিবনারায়ণ দাশ। তবে তাঁর করা নকশায় লাল বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙ্গে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র স্থান পেয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ছাত্র সমাবেশে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকা হিসেবে এ পতাকাই উত্তোলিত হয়েছিল। পরবর্তীতে চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান মানচিত্রটিকে পরিমার্জন করে চূড়ান্ত নকশাটি করেন। বাংলাদেশের পতাকার বিদ্যমান রং দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সবুজ রং মানে বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিকে তুলে ধরে এবং দেশের তারুণ্য ও সজীবতার ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদিকে, লাল রং নতুন দিনের সম্ভাবনার প্রতীক লাল সূর্যকে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের পতাকা বাংলাদেশের মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক। এটি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বহন করে চলেছে। জাতীয় দিবসগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। শোক দিবসগুলোতে জাতীয় পতাকাকে অর্ধ-নমিত রাখা হয়। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। জাতীয় পতাকা আমাদের মাঝে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। এটি আমাদের অন্যতম গর্বের প্রতীক। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখানো এবং এর সম্মান রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা ধারণ করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

রচনা

অধ্যবসায়

ভূমিকা:

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।

অধ্যবসায় ছাড়া মানবজীবনের সাফল্য লাভ সুদূর পরহিত। অধ্যবসায়ই মানবজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। সৃষ্টিকর্তা এই পৃথিবীকে মানুষের জ্ঞান ও সুখের ভান্ডার রূপে তৈরি করেছেন। কিন্তু বিশ্ব সংসারে ছড়ানো এ অনন্ত জ্ঞান, অসীম সুখ কখনোই আপনা হতে মানুষের হাতের মুঠোই এসে পৌঁছায় নি। জগতের কোন কিছু অর্জন সাধনা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জীবনে চলার পথে যে জিনিস যত মূল্যবান, যত দুষ্প্রাপ্য, যত রহস্যময়, যত আকাঙ্ক্ষিত তাকে লাভ করার জন্য চাই তত বেশি পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাধনা। এ সবকিছুই হচ্ছে অধ্যবসায় নামক চরিত্র শক্তির এক একটি বিন্দু। এর সাথে যখনই মিলিত হয় ইচ্ছাশক্তি তখনই মানুষ হতে পারে অধ্যবসায়ী। অধ্যবসায়ের ফলেই মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে, অচেনাকে করতে পারে দৃষ্টিগোচর আর অজেয়কে করতে পারে জয়।

অধ্যবসায়ের পরিচয় বা সংজ্ঞা:

কতগুলো উপাদানের সামগ্রিক গুণের সমষ্টিই অধ্যবসায়। কোন কাজে সফলতা অর্জনের জন্য উদ্যোগ, চেষ্টা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য্য ইত্যাদি সহকারে বারবার প্রচেষ্টার নামই অধ্যবসায়। মনের সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করার সাথে সাথে চরিত্রের অন্যান্য গুণ যখন কাজে লাগানো হয় তখনই অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কর্মপ্রবাহে ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং তাতে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের পথ সহজ হয়ে যায়। অধ্যবসায় মানবজীবনের একটি মস্ত বড় শক্তি। অধ্যবসায়ীকে কোন ব্যর্থতাই দমাতে পারে না অথবা তার লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারে না। সুতরাং মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টার পুনরাবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলে।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা:

অধ্যবসায় ও প্রতিভা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অধ্যবসায়ের সাথে প্রতিভা যোগ হলেই মানুষ বড় কিছু হতে পারে। অধ্যবসায় না থাকলে শুধু প্রতিভা থাকলে কিছুই হয় না। কিন্তু অধ্যবসায় থাকলে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হয়েও বড় কার্য সাধ্য করা যায়।

জগতে বহু বিখ্যাত লোক আছেন যাঁরা প্রতিভাবান অপেক্ষা অধ্যবসায়ী ছিলেন বেশি। বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, **"আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রমের ফলে দুরূহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধারণ করতে পেরেছি।"** ফরাসি দার্শনিক ভলটেয়ার বলেছেন- **"প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও, তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে। "** ডালটন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- "লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।" তাই প্রতিভা লাভ করতে হলে অধ্যবসায়ী হওয়া প্রয়োজন এবং প্রতিভাকে অধ্যবসায়ের গুণে কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় সেপ্রতিভা বিফলে যাবে।

প্রকৃত অধ্যবসায়ী :

সংসারে এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা ব্যর্থতার আঘাতে পর্যদুস্থ হয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। এর কারণ তাদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা নেই। তারা অধ্যবসায়ী নন। প্রবাদে আছে- *"Failure is the pillare of success'* অর্থাৎ ***ব্যর্থতাই সাফল্যের স্তম্ভ***। কথাটা একান্তই সত্য শুধুমাত্র অধ্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। তারা পরাজয় স্বীকার করে না বরং দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয় এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পর্বত প্রমাণ বাধা অতিক্রম করে নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হয়। একবারের প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন এমন খ্যাতনামা লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। ব্যর্থতায় হা-হুতাশ না করে যারা তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন, তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে বিশ্ব সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন আর নিজেদের জন্য অর্জন করেছেন অম্লান গৌরব। আসলে আত্মবিশ্বাস যার যত বেশি তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা তত বেশি। ব্যর্থতার সোপান বেয়ে যিনি সাফল্যের সৌধ নির্মাণ করে তার চূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছেন তিনিই তো প্রকৃত অধ্যবসায়ী। তিনিই জগতের আদর্শ মহাপুরুষ। তিনিই দেশ ও দশের গৌরব।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা:

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়ের এক বিরাট মহিমা। প্রবাদে আছে *"Rome was not built in a day"* অর্থাৎ রোম নগরী যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি মানুষের জীবনের সার্থকতাও হঠাৎ করে একদিনে লাভ করা যায় না। কর্মজীবনে মানুষের সামনে নানারূপ বাধা বিপত্তি আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কেননা জন লিলির মতে, "জীবনের সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবনকে অস্বীকার করা। " রাতের আধারের পর যেমন দিনের আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়, ঠিক তেমনি বার বার অবিরাম প্রচেষ্টার ফলেই ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সাফল্যের শুকতারা।

পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি চারিত্রিক গুণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশ্বাস, মেধা, সুযোগ কোন কিছুই চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিতে পারে না যদি না তাদের যথার্থ প্রয়োগে অধ্যবসায়কে মুখ্য করে তোলা হয়। এ জগত সংসারের প্রতিটি মানুষকে জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। | ব্যক্তি তথা দেশ, জাতি ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাকে কিছু না কিছু অবদান রাখতে হয়। এক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। যে অধ্যবসায়ী নয়, মনের দিক থেকে সে পঙ্গু। ফলে সমাজের মহৎ কোন কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, যা কিছু কল্যাণকর তার সবই অধ্যবসায়ের দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। জগত সংসারে বাধা বিঘ্নতা অতিক্রম করার শক্তি যার যত বেশি, সাফল্যও তার তত বেশি এবং জীবন যুদ্ধে জয় লাভ করার ক্ষমতাও তার ততোধিক।

কবির ভাষায়,

“ ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য্য ধরো বাঁধো বাঁধে বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক। ”

ছাত্রজীবন ও অধ্যবসায়:

অধ্যবসায় গড়ে উঠে ছাত্রজীবনে। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিকাল। কাজেই এ সময়ে অধ্যবসায় শিক্ষা প্রয়োজন। অলস বিমুখ ছাত্র কখনও পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারেনা। একমাত্র অধ্যবসায়ের গুণে মন্দ ছাত্রও পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে। ” No pains no gains"- এ আদর্শ বাক্যটি প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে উপলব্ধি করতে হবে। সব ছাত্র ছাত্রীই মেধাবী নয়। আবার অর্থের অভাবে অনেকে হয়ত পড়াশোনা করতে পারে না। কিন্তু তারা সকলেই যদি অধ্যবসায়ী হয় তবে সকল বাধা কেটে যাবে। ছাত্র ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে ,

“ বারে বারে জ্বলবে বাতি, হয়ত বাতি জ্বলবে না
তা বলে ভাবনা করা চলবে না। ”

সভ্যতা ও অধ্যবসায় :

মানব সভ্যতার ইতিহাসকে যদি নির্ণয় করতে হয়, তবে তার পেছনে যে মাধ্যমটি কাজ করেছে তা হলো কঠোর অধ্যবসায়। পৃথিবীর শুরু থেকে আগুনের ব্যবহার কৃষি, বাসস্থান, রানা এবং সর্বোপরি সব কিছুর মূলেই ছিল অধ্যবসায়। আজকের মানুষ অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে স্বপ্নকে রূপান্তর করছে বাস্তবে। রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ভূ-উপগ্রহ আবিষ্কার ও নক্ষত্র মণ্ডলীতে মানুষের আজ সফল সহজ পদচারণা।

অধ্যবসায় ও সমকাল:

আজ বিশ্ব দ্রুত ধাবমান। তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে যুক্তিগত কার্যক্রম। বিশ্ব আজ ছোট হয়ে আসছে। ইচ্ছে করলেই মুখোমুখি না বসেও কথা বলা যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। মানুষ ছাড়াই ***'পাথ ফাইন্ডার'*** মঙ্গল গ্রহকে জয় করে এসেছে। বিশ্বআজ স্রষ্টার সরোবরে দপুষ্পিত পদ্ম হয়ে তার শোভাকে দ্বিগুণে শোভিত করেছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের অদম্য আবিষ্কারের কৌতূহল এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি তথা অধ্যবসায়। কেননা অধ্যবসায় ছাড়া যদি আবিষ্কারের পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করা যেত তবে মানব সৃষ্টির কোটি বছর পরেও তার বাস্তবায়ন হয় না।

অধ্যবসায় উন্নতির সোপান:

জগতে ধন সম্পদ উপার্জনেও এগুলোর সঠিক সেবা পেতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা চাই। যারা কঠোর পরিশ্রম করতে জানে, আর অধ্যবসায় দ্বারা প্রতিমূলতার মোকাবিলা করতে জানে তারা একটু দেরিতে হলেও উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। আজ আমেরিকা, জাপান কিংবা মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যে পৌঁছেছে তার পেছনে রয়েছে অধ্যবসায় নামক চারিত্রিক গুণ। কারণ প্রবাদে আছে- ***'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'***

ব্যক্তি জীবনে অধ্যবসায় :

অধ্যবসায় ব্যক্তি জীবনকে উন্নত করে। অধ্যবসায় যদি ব্যক্তি জীবনে সম্পৃক্ত হতে পারে তবে সে জীবন অবশ্যই সাফল্যের মুখ দেখবে। মানুষ সারা জীবন চলে সাধনার পথে। পৃথিবীতে সে প্রথমে আসে দুর্বল হয়ে কিন্তু প্রকৃষ্ট সাধনার বলে তাকে যোগ্যতার পরিচয় দান করতে হয়। সুখের উপকরণ জীবনে আরোপিত নয়, তাকে অর্জন করে নিতে হয়। সে অর্জন সম্ভব নয় অলস হাতে, দুর্বল মানসিকতায়। তাই মানুষকে অধ্যবসায়ী হতে হয়। জীবনকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে অধ্যবসায় অবশ্যম্ভাবী। ধনে-মানে, অবদানে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে মহিমান্বিত হলেও তাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। অধ্যবসায়কে করতে হবে জীবনের মূলমন্ত্র। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন -

“ কোন কাজ ধরে যেউত্তম সেই জন হোক সহস্র বিঘ্নছাড়ে না কখন। "

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা :

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি প্রকৃত অধ্যবসায়ী হয়ে উঠে তাহলে সে জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের ন্যায্য অধিকারী হয়ে উঠবে। জাতির জ্ঞানী, গুণী, শ্রেষ্ঠ, বীর, আবিষ্কারক, সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধনার দ্বারাই সাফল্য লাভ করে জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। যে জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী, সে জাতি তত বেশি উন্নত বলে সম্মানিত। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবদীপ্ত সাফল্য দেশবাসীর অধ্যবসায়ের ফল। আবার জাতির অনগ্রসরতা জীবনে অধ্যবসায় হীনতারই কুফল। সবাই একনিষ্ঠভাবে জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগ করলে মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। অধ্যবসায়ের যে পথ ধরে আজকের বিশ্ব সভ্যতার উত্তরণ ঘটছে সে পথেই আগামী দিনের উন্নততর বিশ্ব গঠন করতে হবে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, জাতির জন্য সর্বোপরি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয়।

অধ্যবসায়ীদের কতিপয় দৃষ্টান্ত :

জীবন সংগ্রামে সাফল্যের গুপ্তদ্বার হল অধ্যবসায়। যুগ যুগের ইতিহাস কালের পর্দায় রেখে গিয়েছে তারই প্রমাণ। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিই পৃথিবীর বুকে আপন কীর্তির দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে। *স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস* অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজদের সাথে পর পর ছয় বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে বনে পালিয়ে যান। একদিন এক পরিত্যক্ত দুর্গে তিনি চিন্তামগ্ন ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা একটি স্তম্ভের গায়ে উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু বার বার খানিকটা উঠেই পড়ে যাচ্ছে। পর পর ছয় বার বিফল হবার পরে সপ্তম বারের প্রচেষ্টায় সে স্তম্ভের গায়ে উঠতে সক্ষম হল। সামান্য একটি প্রাণীর এরূপ অদম্য প্রচেষ্টা ও সাফল্য লাভের দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। *আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাসের* ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি যখন পর্তুগালে রাজসভায় আমেরিকা আবিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন স্বয়ং রাজা পর্যন্ত রসিকতা মনে করে হাসিতে এ প্রস্তাব উড়িয়ে দেন। কিন্তু অধ্যবসায়ের মূর্ত প্রতীক কলম্বাস সব বাধা বিঘ্নতা উপেক্ষা করে মাত্র কয়েকজন সহচর নিয়ে জাহাজ নিয়ে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। নতুন মহাদ্বীপ আবিষ্কারের নেশায় তিনি যে অবিচল অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তার ফলস্বরূপ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর অক্ষত্র গৌরবের মুকুট তাঁর মস্তকে উপস্থাপিত হয়। সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর কাজে রেখে গিয়েছিলেন অধ্যবসায়ের অজস্র নিদর্শন। কোন কাজকেই তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন না।

তিনি বলেন –*"Impossible is a word that is found in the dictionary of fools"* তাই আমরা দেখতে পাই সামান্য এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও একমাত্র অধ্যবসায়ের গুনেই তিনি ফরাসি জাতির ভাগ্য বিধাতার পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। *মনীষী কার্লাইল* ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস লিখে এক প্রতিবেশিকে পড়তে দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিবেশি বন্ধুটি সেই বইটি ভুলক্রমে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ফলে বইটি হারিয়ে যায়। পরে অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়, বাড়ির চাকরাণী বইটিকে বাজে কাগজের দলা মনে করে পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু কার্লাইল হতাশ না হয়ে পুনরায় বইটি লিখেন। বাল্যকালে *রবার্ট পিলের* বাবা তাকে টেবিলের উপরে উঠিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করতে বলতেন। প্রথম প্রথম কিছু না হলেও পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে তাঁর মধ্যে বক্তৃতা প্রদানের শক্তি জেগে উঠে। পরবর্তীতে তিনিই হয়েছিলেন একজন প্রখ্যাত তর্কবিদ। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও সুকঠোর সাধনার বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানের সম্মান লাভ করতে পেরেছিলেন। দুখু মিয়া, কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করেও কবিতা, | গান, গল্প, নাটক ইত্যাদিতে রেখেছিলেন অবিনশ্বর প্রতিভার স্বাক্ষর। শুধু অধ্যবসায়ের গুণেই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক *হযরত মুহাম্মদ (স), শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট* সকলেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

অধ্যবসায়হীনের অবস্থা :

অধ্যবসায়ের অভাবে অনেক সম্ভাবনা অকালে শেষ হয়ে যায়। অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি জগতের কোন কাজেই সফল হয় না। তার জীবন ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে যায়। তার স্মৃতি হারিয়ে যায় বিস্তৃতির অতল গর্ভে। তার ঠিকানা নির্ধারিত হয় সমাজের সর্বনিম্ন আস্তাকুঁড়ে।

অধ্যবসায় ও বাঙালি জাতি :

আমরা বাঙালি জাতি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের অনেকের মধ্যেই এ মহৎ গুনটি অনুপস্থিত। আমাদের মধ্যে নেই কোন প্রচেষ্টা, নেই কোন উদ্যম, নেই কোন আগ্রহ। বরং আছে আস্ফালন, হুঙ্কার, মিথ্যে গরিমা ও নিজেকে প্রকাশ করার বাহাদুরি। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়,

" ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো
পোষ মানা এ প্রান
বোতাম-আঁটা জামার নিচে
শান্তিতে শয়ান। "

কেবলমাত্র অধ্যবসায়ের অভাবেই উন্নত বিশ্বের তুলনায় আজ আমরা যোজন যোজন পিছিয়ে আছি। সুতরাং, আর একটি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিজেদের অধ্যবসায়ী রূপে গড়ে তোলা আমাদের একান্ত জরুরি।

উপসংহার :

অটল অধ্যবসায় ঋষির তপস্যারই নামান্তর। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারে। কঠোর তপস্যা শেষে সাধক যেমন ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করতে পারেন, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের পরিনামেও মানুষ লাভ করে ঈপ্সিত সাফল্য। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সাফল্য লাভ করে নিজেও গৌরবান্বিত হয়, দেশ ও জাতির মুখ ও উজ্জ্বল করে।আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে-

"সুন্দর দিন সবার জন্যই অপেক্ষা করে
কেউ ডেকে আনে, কেই আনে না। "

এই আনা না আনার সঙ্গেই অধ্যবসায়ের সম্পর্ক। আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হলে জীবনে সফলতা অনিবার্য। *"life is not a bed of roses"* জীবন পুষ্প শয্যা নয়। দুর্গমতা, বাধা-বিঘ্নতা অতিক্রম করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে পারলেই আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

সারাংশ

স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাহাদের আবেদন নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু-চার জন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে, সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

[দিনাজপুর বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

স্বাধীনতা অর্জন করার মতো সেই স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়াস দরকার হয়। দরকার হয় জাতি হিসেবে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকার। এই পথ কঠিন হলেও, জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এর বিকল্প নেই।

10 MINUTE SCHOOL

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি বলতে চাই নে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করো। তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

[দিনাজপুর বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

অপরের জন্য প্রাণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র সামান্য একটু মিষ্টি কথাই মানুষকে অনেকখানি স্বস্তি দিতে পারে। সামান্য সহানুভূতিই মানুষের দুঃখ অনেকখানি লাঘব করতে পারে। প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ মাত্রই এভাবে অন্যের দুঃখ লাঘবে সচেষ্ট থাকেন।

SYLHET BOARD

অনুচ্ছেদ

একুশে বইমেলা

[দি. বো. ১৯, ১৭; সি. বো. ১৭; য. বো. ১৯; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; নোয়াখালী জিলা স্কুল]

অমর একুশে গ্রন্থমেলা বর্তমানে বাঙালির প্রাণের মেলা। এই মেলার ইতিহাস বাংলাদেশের মতই প্রাচীন। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী এ মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন অনেক বিস্তৃত ও পরিণত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম এই মেলা। বইপ্রেমী বাঙালির চাহিদা মেটাতে বাংলা একাডেমি ২০১৪ সালে মেলার পরিসর বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করেছে। ক্রেতাদের আকর্ষণে প্রকাশকদের আয়োজনের কমতি থাকে না। নান্দনিক স্টল ও দৃষ্টিনন্দন বই পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে নতুন বই হাতে তুলে নিতে। মাসব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় ক্রেতাদের জন্য থাকে বিশেষ ছাড়। বিখ্যাত লোকদেরও দেখা মেলে মেলায় এলে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন আলোচনাসভা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে লেখককুঞ্জ, যেখানে লেখকরা উপস্থিত থাকেন ও পাঠকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এটি বাংলা একাডেমির একটি মহৎ উদ্যোগ ও আয়োজন। এই মেলা নিত্যনতুন পাঠক তৈরিতেও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। সারা বছর নানা বয়সি মানুষ এ মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। লেখক-প্রকাশক-পাঠকের অসাধারণ এক সেতুবন্ধ রচিত হয় এ মেলায়। এখানে এলেই সাহিত্যের সকল রসদের সন্ধান পান সকল শ্রেণীপেশার মানুষ। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত।

ভাবসম্প্রসারণ

দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।

বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ।

বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

[সি. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:য, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতি একটি জাতিকে নিঃশেষে ঠেলে দেয় অক্ষয়ের পথে। তাই একে দেখা হয় "অভিশাপ" রূপে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শিক্ষা ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে দান করেছে এ মহিমান্বিত মর্যাদা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সততা ও সুনীতির প্রশ্নে মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতা আজ তর্কাতীত নয়। কোনো জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণে সততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে। সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে জাতীয় অস্তিত্ব। সম্প্রতি আমাদের দেশে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি। দুর্নীতি একটা জাতীয় সমস্যা। মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কালক্রমে এটা অনিবার্য পথ ধরে গ্রাস করে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই অবলম্বন করতে থাকে এ অসুদপায়টি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন। এগুলো দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে জাতি হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত— যা তাদের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দিয়ে থাকে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির রাহু যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে উন্নতির আশা করা বৃথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত সকল মহল এই চলেছে দুর্নীতির মহোৎসব। অনেকে মনে করেন, দরিদ্রতার ফলেই আবির্ভূত হয় দুর্নীতি। অর্থাৎ সৎ পথ থেকে জীবনযাত্রার মান সঠিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই অফিস-আদালতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ঘুষ গ্রহণ করেন।

কিন্তু দারিদ্র যে দুর্নীতির মূল কারণ নয় ,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের উঁচু মোহলের বহু রাঘব-বোয়ালকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থ করেছেন। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন পালন করছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। দেশের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা , মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির নোংরা প্রবণতাকে। দুর্নীতির এ নেতিবাচক দিকটার সবচেয়ে বড় শিকার হয় যুবসম্প্রদায়। পরিশীলিত চিন্তাবোধের অভাবে সাফল্যলাভের জন্যে তারা সহজেই অশুভ ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এভাবে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট ।

দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের বিশেষত দেশের শিক্ষিত সমাজকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গড়তে হলে জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি অপসারণ করা অতীব জরুরি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BARISAL BOARD

সারাংশ

তুমি জীবনকে সার্থক-সুন্দর করিতে চাও? ভালো কথা। কিন্তু সেজন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। সব তুচ্ছ করিয়া যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পার, তবে তোমার জীবন সুন্দর হইবে। আরও আছে। তোমার ভিতর এক 'আমি' আছে যে বড় দুরন্ত। তাহার স্বভাব পশুর মতো বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগবিলাস চায়। সে বড় লোভী। এই 'আমি'-কে জয় করিতে হইবে। তবেই তোমার জীবন সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

[বরিশাল বোর্ড '১৭]

সারাংশঃ

জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আর তার সাথে সাথে নিজের ভেতরের ভোগবিলাসী স্বত্ত্বাকেও জয় করতে হবে। এই দুই করতে পারলেই জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

ভাবসম্প্রসারণ

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন

[ব.বো.১৭]

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই চেতনাধারী মানুষগুলো যখন বুঝতে পারলো সংঘবদ্ধ হলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব, তাদের সেই চেতনায় একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের আত্মপ্রত্যয়ী করে তুললো। একটা স্বাধীনতা অর্জন মানে লাখো প্রাণের ক্ষয়, হাজারো দিনের সংগ্রাম, অপূরণীয় ক্ষতির খতিয়ান। এক সময় বহু প্রতীক্ষার পর সে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসেও। কিন্তু তার পরবর্তী তে যে মহামুল্যবান স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ তাই কী কম সংগ্রামের? মোটেও নয়। কেননা স্বাধীনতা অর্জন যত কঠিন, তা রক্ষার অধিকার তার চেয়ে অনেক কঠিন।

স্ব+অধীনতা = স্বাধীনতা, অর্থাৎ নিজের অধীনতা। অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া, অন্যের অধিকারে বা শাসনের বাইরে থাকার নামই হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা একটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং এটি প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আলোক বার্তীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেন নদী টেকে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনও বাঁচতে পারে না।" অথচ এই স্বাধীনতা সহজেই অর্জিত হয় না। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হয়, নষ্ট করতে হয় দেশের অনেক জাতীয় সম্পদ, হারাতে হয় অনেক মানুষের জীবন। রাজার অভাব হলে রাজা পাওয়া যায় কিন্তু স্বাধীনতা একবার বঞ্চিত হলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। এই স্বাধীনতা অর্জন করা বড়ই কঠিন। পীড়িত, অত্যাচারিত জাতি মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করে থাকে। কিন্তু এ মুক্তি অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। একে সমুন্নত রাখাই মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাধীনতাকে রক্ষা করে তাকে ফলপ্রসু করতে হলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করে তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জন। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়।

বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হলেও তাকে রক্ষা ও ফলপ্রসু করার কাজ আরও কঠিন। তাই স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তখন একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীর অনুচরদের জিঘাংসা ও মরণকামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের অভ্যন্তরীণ রেষারেষি।

পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও মনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এসব ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা। অনেক সময় সমস্যাই সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এসব ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা। অনেক সময় এ সমস্যাই সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখা দেয়া হতাশা, কমে যায় কর্মোদ্দীপনা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতি মুখ থুপড়ে পড়ে। তখন স্বাধীনতার দূরত্ব, তাৎপর্য ও মর্ম রক্ষা করার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মানুষ কখনো নিশ্চল জীবন যাপন করতে পারে না। তাই দেখা যায় স্বাধীনতার সংগ্রাম বিধ্বস্ত করেছে অজ্ঞাত অনেক জাতিকে, আবার কঠোর সংগ্রামের জোরে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা পেয়েছে অনেক দেশ। কিন্তু এখানেই সব নয়। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাই স্বাধীনচেতা হয়ে গড়ে উঠতে দেয়ার তার মৌলিক অধিকারের প্রধান আকাঙ্খা। কিন্তু এই অধিকারের বিঘ্ন ঘটলেই কিংবা তাতে বাঁধা আসলে তাকে বলা হয় পরাধীনতা। অর্থাৎ যে চেতনার সঞ্চালক নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যের দ্বারা তাই পরাধীনতা। কিন্তু এই মৌলিক চেতনা বা মৌলিক অধিকার কী তা স্বাধীনতা অর্জনের পরও যদি আমরা নির্ধারণ না করতে পারি বা অর্জন না করতে পারি তবে বুঝতে হবে স্বাধীনতার অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারিনি। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। দীর্ঘ নয় মাস ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা বাঙালি জাতি অর্জন করেছে তার কী সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন যথাযথ পূরণ হয়েছে? দ্বিমত থাকলেও সত্যিকারভাবে তার চেতনা আজও আমাদের দ্বিধা বিভক্ত করে রেখেছে। কেননা স্বাধীনতা অর্জনের পরই হচ্ছে মৌলিক সংগ্রাম। দেশের জনগণকে কীভাবে বাঁচানো যাবে; কীভাবে সবার মৌলিক অধিকার আদায় করা যায় তখন তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পূর্ণগঠন, উন্নয়ন ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করার অঙ্গীকার সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সমান কার্যকর থাকা প্রয়োজন । কেননা স্বাধীনতা লাভের পর লোভ , হীনতা , স্বার্থপরতা ও দেশপ্রেমের বিপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পরাধীন চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মূলত স্বাধীনতা অর্জনের পর তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও জনগণের সঠিক মূল্যায়ন ও তার জন্য সুচিন্তিত প্রযুক্তি ধারণ করতে পারলেই স্বাধীনতা অর্জন হয় সার্থক। এ কথা সত্য যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এসব মৌলিক অধিকার পুরণ করতে গিয়ে স্বাধীনতার অঙ্গীকার রক্ষা করা অনেক কঠিন।

স্বাধীনতা আমাদের কাছে আমানতস্বরূপ। লক্ষ-কোটি প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তার সম্মান রক্ষা করাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ ক্ষেত্রে সবার সজাগ মনোতারই পারে স্বাধীনতাকে তার অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছে তাকে সার্থকতায় রূপদান করতে।